অষ্টম অধ্যায়
ঔপন্যাসিক হিসেবে মূল্যায়ন

''জগদীশ গুপ্ত কোনোদিন কল্লোল-অপিসে আসেননি। মফস্বল শহরে থাকতেন, সেখানেই থেকেছেন স্বনিষ্ঠায়। লোককোলাহলের মধ্যে এসেই তিনি সাফল্যের সার্টিফিকেট খোঁজেন নি। সাহিত্যকে ভালোবেসেছেন প্রাণ দিয়ে। প্রাণ দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। স্বস্থান সংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার।

অনেকের কাছেই তিনি অদেখা, হয়তো বা অনুপস্থিত। নদী বেগ দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি একটা বড় রকমের বেগ।''[১]

বাস্তবিক অর্থেই 'স্বস্থান সংস্থিত একনিষ্ঠ শিল্পকার' ছিলেন জগদীশ গুপ্ত। একেবারেই অন্য ধারার শিল্পী ব্যক্তিত্ব। আসলে সত্যিকারের প্রতিভারা এমনই হয়। তাঁরা সমসময় যুগের অনেক আগে জন্মান। যুগ যদি হয় একটি ছোটো সাইজের জুতো, তাহলে প্রতিভা হল বড় আকারের পা। যদি ওই পায়ে ছোটো জুতোজোড়া পড়তে হয়, তাহলে সেই পা'কে ক্ষত-বিক্ষত হতেই হয়। অনেক কাল পরে সেই প্রতিভার মূল্যায়ন হয়; হয়তো তখন আর সেই প্রতিভা ইহজগতে থাকেন না। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ সক্ষম কবি হিসেবে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। সেই সমসময়ে ভারতচন্দ্র অনায়াসেই বলেছিলেন—

''পড়িয়াছি সেইমত, লিখিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।।
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।।''[২]

কতটা আত্মপ্রত্যয় থাকলে এমন অকপট সত্য উচ্চারণ করা যায়। তবুও সেই ১৭৫২ খ্রীঃ বাংলাদেশের সমাজ প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। কিংবা সেই দৈব নিয়ন্ত্রিত সমাজের মাটিতে দাঁড়িয়ে যিনি উচ্চারণ করতে পেরেছেন, 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।' এহেন প্রতিভার প্রকৃত

মূল্যায়ন হয়েছে অনেক পরে। রবীন্দ্রনাথের মতো আরেক প্রতিভা বুঝেছিলেন; ভারতচন্দ্রের কাব্য রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তার উজ্জ্বলতা, তেমনি তার কারুকার্য। কিন্তু প্রকৃত প্রতিভারা এরকম মূল্যায়িত হবার কোনো প্রত্যাশা রাখেন না। তাঁরা নিজের খেয়ালেই সৃষ্টি করে যান। এই সৃষ্টির আনন্দই তাঁদের কাছে বড় প্রাপ্তি। তাঁরা 'বর্তমানের কবি' হয়েই জন্মান, ভবিষ্যতের 'নবী' হবার কোনরকম স্বপ্ন তাঁরা দেখেন না। বরং তাঁরা সমকালের অন্যদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেন অনায়াসেই। কাজী নজরুল ইসলাম যেভাবে তাই লিখেছিলেন—

''বড়কথা বড় ভাব আসে নাক' মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে!
পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।''[৩]

এটাই প্রকৃত প্রতিভার ধর্ম। তাঁরা যথার্থ বিনয়ী। সৃষ্টির সুধারস তাঁর বিলিয়ে দেন জীবনের হলাহল পান ক'রে। ভাবীকালের পাঠক তাঁদের খুঁজে নেয় ফেলে আসা পথের ধার থেকেও। যুগে যুগে এটাই হয়ে এসেছে। হয়ে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরী কল্লোলীয়দের তুলনায় খানিকটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ জগদীশবাবুও ছিলেন এমন একটি 'অনুপস্থিত', 'অদেখা' প্রতিভা—যিনি সমকালের কোনোরকম স্বীকৃতি বা সম্মানের কথা না ভেবে কোনোরকম প্রচারের আলোয় না এসে নীরবে নিঃভৃতে বসে সাহিত্য-সাধনা করেছেন। কলকাতা কেন্দ্রীক পাদপ্রদীপের আলো থেকে দূরে বসে, মফঃস্বল শহরের কলোনীর ঘরে বসে সৃষ্টি করে গেছেন একের পর এক উপন্যাস ও ছোটোগল্প। দীর্ঘ তিন দশক ধরে চলেছে এই নিঃভৃত সাধনা। কাজী নজরুল ইসলামের মতোই তিনি অন্যদের জন্য চিরন্তন সাহিত্য রচনার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলেন। 'কালিকলম' পত্রিকায় সম্পাদক মুরলীধর বসুকে কুষ্ঠিয়া থেকে একটি চিঠিতে নিজের লেখার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন—

''লোকের মুখে আমার লেখার প্রশংসা শুনিয়া আপনার বিদেশ ভ্রমণের আনন্দ বাড়িতেছে শুনিয়া যথার্থই তৃপ্ত হইয়াছি। আনন্দ দেওয়া আর আনন্দ পাওয়া ছাড়া লেখার

আর কোনো সার্থকতা আমি প্রত্যাশা করি না। যাঁহারা অসাধারণ প্রতিভা লইয়া লিখিতে বসেন, তাঁহারা ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া তোলেন, কিন্তু আমাদের সাময়িক একটু আনন্দই হয় লাভ।"[৪]

এমন অকপট সত্য-ভাষণ জগদীশবাবুর মতো প্রতিভাই উচ্চারণ করেছেন নির্দ্বিধায়। তবে তিনি কেবলই সাময়িক আনন্দটুকু লাভ ছাড়াও যে ভাবীকালের সাহিত্য পাঠকদের জন্য আরও অতিরিক্ত কিছু রেখে গেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরই পাশাপাশি সমকালের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর ভাবনার প্রসঙ্গ টেনে নিজের অভিমতকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু বাঙালী গল্পকারদের বিষয়বস্তুর অভাবজনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, কবিতার চর্চা যত অনায়াস ভঙ্গীতে স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করতে পারছে, সেই তুলনায় ছোটগল্পের সম্ভাবনা খুবই কম। এবিষয়ে জগদীশবাবু তাঁর আপত্তির কথা জানিয়ে মুরলীধর বসুকে আরেকটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

"... আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, শুধুমাত্র সামাজিক বা সাংসারিক ঘটনা লইয়া গল্প লিখিবার রেওয়াজ যখন ছিল, তখন একথা বলা চলিত। কিন্তু, এখন সে কায়দা ত' নাই... উন্মুখ প্রবৃত্তি লইয়াই এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াই এখন গল্প লেখা চলিত হইয়াছে। কাজেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সঙ্গে যার যত পরিচয়, বা সে বিষয়ে যার যত অন্তর্দৃষ্টি, তার গল্প তত বিচিত্র হইবে।"[৫]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সময় জগদীশবাবু বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে ছোটোগল্পের 'উল্কাবৃষ্টি' করছেন এবং 'তাঁর পক্ষে উপন্যাস লেখা প্রায় অসম্ভব-দুরূহ' বলে স্বীকারোক্তিও করেছেন। কিন্তু এটাও ছিল তাঁর নিতান্ত অহংবোধ শূন্যতার অমায়িক পরিচয়। কারণ এই ধরণের বিনম্র ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করার মাত্র দু'বছরের মধ্যে 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র মতো উপন্যাস লিখে ফেলেছেন। এবং এই উপন্যাসটি যে শিল্প হিসেবে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট মানের তা সমালোচকদের দ্বারা সমর্থিতও হয়েছে পরবর্তী সময়কালে।

■ বাংলাদেশের বিশিষ্ট সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান উপন্যাসটি সম্পর্কে জানিয়েছেন—

''... অসাধু সিদ্ধার্থ জগদীশ গুপ্তের সবচেয়ে পরিচিত উপন্যাস। আর এই উপন্যাসটি দিয়েই শুরু হয়েছে বাংলা কথা সাহিত্যের নতুন যুগের।''[৬]

কিংবা, আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

''... স্বাভাবিকতা নামক একটি আশ্চর্য বিষয় আছে লেখকের দখলে, যার পরাকাষ্ঠা আমাদের স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করতে শিখিয়ে দেয়—যার বিকল্প স্বাভাবিকতা পাঠক ভাবতেও পারে না। অসাধু সিদ্ধার্থ এই ধরণের স্বাভাবিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে পরবর্তীকালে এই স্বাভাবিকতাকেই ব্যবহার করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসে।''...[৭]

■ অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন—

''... জগদীশ গুপ্তের কাছে এই গল্পের অর্থ অন্যতম। 'নিজে যা নয় ছদ্ম আচরণে নিজেকে তাই প্রতিপন্ন করবার প্রাণান্ত প্রয়াস তো প্রত্যেকেরই জীবনের এক অংশ'—এই জীবনগত চিরন্তন অদৃষ্ট লিখনের টানে আমাদের ব্যর্থতার জন্ম। সিদ্ধার্থের ছদ্মবেশের ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের ব্যর্থতা।''[৮]

ড. সুমিতা চক্রবর্তী উপন্যাসটির খানিকটা সমালোচনা করেও লিখেছেন—

''অপরূপ কবিত্বময়, গভীর ও সূক্ষ্মতম মনস্তত্ত্বের কারুকার্যে সাজানো—প্রেমের, সততার, শুদ্ধতার স্বপ্ন জড়ানো—বাস্তবে প্রতীকে মেলানো 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ হয়ে থাকে।''[৯]

এইসব আলোচনায় উপন্যাসের, বিশেষ করে আধুনিক কালের বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের কোনরকম সংশয় থাকে না।

প্রথম উপন্যাস 'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯) এর স্বীকৃতি থেকে মৃত্যুর তিন বছর পর প্রকাশিত 'কলঙ্কিত তীর্থ (১৯৬০) পর্যন্ত তিন দশক কাল ধরে জগদীশ গুপ্ত ঔপন্যাসিক হিসেবে বাংলা উপন্যাসের ধারায় একটি নিজস্ব ঘরানা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ-প্রভাত কুমার-শরৎচন্দ্র এবং অন্যদিকে কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক

শৈলজানন্দ-প্রেমেন্দ্র মিত্র-অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মধ্যবর্তী সেতু স্বরূপ। তাঁর এই ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বীকৃতি জানিয়ে অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপ্যায় লিখেছেন—

''রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের যৌথ প্রয়াসে যে সাহিত্য রুচি গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তের। জগদীশ গুপ্তের বিভিন্ন সৃষ্টি একটা গোটা সাহিত্যিক যুগের প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত। সেই গভীর তাৎপর্যেই এই লেখক বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। অন্যদের ক্ষেত্রে যেখানে প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটা ছিল বুদ্ধি সম্ভব উপলব্ধি, জগদীশ বাবুর ক্ষেত্রে সেখানে উপলব্ধিটা জীবনবোধের ফল। জীবনের গূঢ় সমস্যা হিসেবেই তিনি বিষয়গুলিকে শিল্পী হিসাবে ধারণ করেছিলেন।''[১০]

স্বভাবতই জগদীশগুপ্তের কালের সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর একটা মেরুকরণ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেরুকরণগুলি হল—

■ **রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ গুপ্ত :**

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কীসে আর কীসে। কিন্তু সুগভীর বিশ্লেষণের নিরীখে দেখা যাবে, জীবন-সমুদ্র মন্থন করে রবীন্দ্রনাথ যেমন উজ্জ্বল মুক্তো তুলে এনেছিলেন তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যদিয়ে, তেমনি জগদীশ গুপ্ত তুলে এনেছিলেন অসংখ্য কালোমুক্তো। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা উপন্যাসের যে সূচনা তা আধুনিক জীবনের রাজপথ ধরে এগিয়ে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে। ১৮৬৫-১৮৮৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্কিম উপন্যাসের যে ধারা ক্রমশঃ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল তাকে নতুন ভাবে গতি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ১৯০৩-১৯৩৪ খ্রী পর্যন্ত উপন্যাসের মধ্যদিয়ে। ১৮৭৭ খ্রীঃ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'করুণা' ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, যেটিকে উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বালকোচিত কাঁচা বয়সের লেখা বলে স্বীকৃতি দেননি। আর ১৮৮৩ খ্রীঃ 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ প্রকাশিত 'রাজর্ষি' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের ছায়া তখনও ছিল। সেদিক থেকে 'চোখের বালি'র (১৯০৩) মধ্যদিয়েই তাঁর এবং বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাঁর এই প্রতিভার বিচ্ছুরণকে স্বীকৃতি জানিয়ে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই

লিখেছেন—

''বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন রুদ্ধপ্রায় হইয়াছিল তখন রবীন্দ্রনাথই তাহার জন্য নূতন পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা যাহা স্পর্শ করিয়াছে তাহাই দ্যুতিমান হইয়া উঠিয়াছে এবং উপন্যাসের উপর তাহার প্রভাবের যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা মুছিবার নহে, আধুনিক বঙ্গ উপন্যাস তাঁহার প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে।''[১১]

খুব অদ্ভুত হলেও এটাই অপ্রিয় সত্যি যে শ্রীকুমার বাবুর মত সমালোচকের আলোচনায় জগদীশ গুপ্ত অন্তর্ভুক্ত হয় নি; যদিও তাঁর 'উপন্যাসের ধারা' সুবৃহৎ পরিসর জুড়ে এগিয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে জগদীশবাবু প্রথম আলোচনায় যথার্থ স্থান করে নিয়েছেন অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তরে; পরবর্তী সময়ে ড. অশ্রুকুমার সিকদারের 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে। প্রসঙ্গত ঔপন্যাসিক হিসেবে জগদীশবাবুর মূল্যায়ন যাঁরা এমনভাবে করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে—

■ ''... রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের প্রতিক্রিয়া তাঁর রচনায় পরিস্ফুট কিন্তু র্তার এই প্রতিক্রিয়ার জন্ম জীবন-বিষয়ক বক্তব্য থেকে। সে বক্তব্য হল এই : মানুষ তার কর্মফলকে মুছে স্বাধীন শুদ্ধতাভিসারী হতে চায়। উত্তম, নটবর, কিশোরী—এরা সকলেই তাঁর এই বক্তব্যের প্রমাণ। অনন্ত প্রয়াসশীল মানুষের যন্ত্রণাকে, পরাভবকে যিনি এঁকেছেন তিনি মানুষকে ছোট করে আঁকেন নি। জগদীশগুপ্ত সম্বন্ধে এইটাই প্রধান কথা।''[১২]

— অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

''...রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যেখানে মানুষের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেখানে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যের মূল কথাই হলো মানুষের মনুষ্যত্বে অবিশ্বাস।''[১৩]

—ড. অশ্রুকুমার সিকদার

■ ''রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রীয় রুচি, রূপ, রীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য ও বিচূর্ণ করে আধুনিক বাঙলা কথাসাহিত্যে যে পালাবদল এসেছিল, জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) ছিলেন তার প্রধান ঋত্বিক। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার কার্যকারণ সূত্রে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক

কাঠামোর অন্তর্গত সংকট ও সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জীবন-অন্বেষা ও সমাজ বাস্তবতার যে শিল্পভুবন নির্মিত হয়েছিল, তিনিই ছিলেন তার উদ্বোধক ও শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।"[১৪]

—আবুল আহসান চৌধুরী।

বস্তুত আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ জীবনের আলোকোজ্জ্বল দিকটির উপর এতো বেশী আলো ফেলেছিলেন, কিংবা মানুষগুলোকে অন্ধকার থেকে আলোর ভুবনে পৌঁছে দিয়েছিলেন, জগদীশ গুপ্তে সেই আলোকময়তা নেই বললেই চলে। কিন্তু সেইসব অন্ধকারবাসী মানুষগুলোর অন্তরে আলোয় ফেরার অকুলতা ছিল। সেটাকে লেখক ইঙ্গিতে স্পষ্ট করেছেন। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটির সঙ্গে জগদীশবাবুর 'গতিহারা জাহ্নবী' উপন্যাসের একটা অদ্ভুত সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। যোগাযোগের কুমুদিনী যখন স্বামী মধুসূদনের সঙ্গে রুচি-শিক্ষাদীক্ষার কারণে পেরে না উঠে দূরে সরে যাবার কথা ভেবেছে, সেই সময়ই সে অনুভব করেছে, সে মা হতে চলেছে। এই মাতৃত্বের কারণেই সে আর চলে যেতে পারেনি। কিশোরীও শেষ পর্যন্ত অনুভব করে সে অকিঞ্চনের সন্তানের 'মা' হতে চলেছে, তখন সেও এক প্রবল দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়েছে। সে তখন নিজে কোনো দিশা না পেয়ে মায়ের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে—

"... আমি কিছুই চাইনে, মা, আমি কিছুই চাইনে। ... তোমরা আমায় কেটে ফেল্‌তে পারো, মা? ... আমার পেটে ছেলে এসেছে। তোমার পায়ের তলায় আমি পড়লাম, যা' খুশী করো।"[১৫]

অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কিশোরীকে 'মৃত' বলেছেন। আপাতদৃষ্টিতে সে মৃতই এবং কুমুদিনীও ছিল 'মৃত'—যদিও দু'জনের মৃত্যু এসেছে ভিন্ন পথে। কুমু'র ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিত্বের মৃত্যু আর কিশোরীর মৃত্যু দৈব-নিধারিত। একইভাবে 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের শেষে নকল সিদ্ধার্থ যখন কাশীনাথের সত্য উন্মোচনের ফলে দিশেহারা হয়ে বলেছে—

"...ভগবান জানেন আমি নিরপরাধ। নিয়তির চক্রান্তে ভালোবেসেছিলাম। ভালোবাসার তাড়নায় আর প্রতিদানের লোভে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু আমি ত' সেই মানুষ।"[১৬]

এইভাবে নিয়তি নির্দেশিত পথে কিশোরী কিংবা সিদ্ধার্থ ওরফে নটবরের জীবন প্রবাহিত হয়েছে। এই পথেই 'তাতল সৈকতে'র শরৎ কিংবা 'মহিষী' উপন্যাসের জ্যোতির্ময়ীর জীবনের গতি বদলে গেছে। জগদীশবাবু কিন্তু কেবল 'মনুষ্যত্ব ধর্মের স্তবে' নিরুত্তর থেকে থেমে যাননি, তিনি মানুষগুলোর এই অসহায় অবস্থার জন্যে নির্দিষ্ট কারণগুলিও চিহ্নিত করেছিলেন। আসলে জীবনের অন্তর্নিহিত শুদ্ধিভবনের শক্তিকে জগদীশবাবু পরাভূত হতে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর এই জীবনবোধ কোন অংশেই উপেক্ষার নয়, বরং আজকের যন্ত্রণা জটিল সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের পাশে জগদীশবাবুও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

জগদীশবাবুর 'লঘুগুরু' উপন্যাসটির রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনার সূত্রে দুই প্রতিভার দুই ভিন্নমুখী দিকের পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। 'পরিচয়' পত্রিকার 'পুস্তক পরিচয়' অংশে রবীন্দ্রনাথ বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে দুটি বিষয় মানতে পারেননি—উপন্যাসে বর্ণিত সমাজচিত্রের বাস্তবতা আর গণিকা উত্তমের গৃহী নারী হয়ে ওঠার স্বপ্ন এবং সেই সঙ্গে 'কোমর বাঁধা শয়তান' পরিতোষ চরিত্রটির শৈল্পিক যথার্থতা। এই দুটি ক্ষেত্রের সমালোচনা করে লিখেছেন—

"... এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে, আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয়, তবু আমি নাচার। বলে রাখছি, এদেশে লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে কাটালুম, এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত-সমুদ্র-পারের বিদেশ বলিলেই হয়। দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতি-পরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।"[১৭]

কিংবা গণিকা উত্তমের পূর্ব-জীবনের পরিচয় না দিয়ে তাকে গৃহী নারী করে তোলার প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথের অবাস্তব বলে মনে হয়েছে—

"... কোনো এককালে তার পতন হয়েছে বলেই যে, সে মেয়ে নষ্ট হবে, এমন কথা নেই, কিন্তু সেটা প্রমাণের দায় লেখকের পরে। অর্থাৎ পতনের ইতিহাসটাকে একেবারে চাপা দিয়ে রাখলে মনে হয় যে, পতিতা নারীর মধ্যেও সতীত্বের উপাদান অক্ষুন্ন থাকতে পারে, এই তত্ত্বটাকে একটা চমক লাগানো অলংকারের মতোই ব্যবহার করা হয়েছে।"[১৮]

এরই পাশাপাশি উপন্যাসের দুই নায়ক বিশ্বম্ভর ও পরিতোষ। প্রথম জন স্বভাবসিদ্ধ ইতর আর দ্বিতীয়জন কোমর বাঁধা শয়তান। বিশ্বম্ভরের ইতরতার নোংরা রং বেশ মূর্তিমান, মানুষটিও অকৃত্রিম ছোটোলোক, অসংকুচিত। আর ইতরতা পদার্থটা সংসারে সুলভ। কিন্তু 'খাঁটি সয়তানী এত সামান্য নয়, খাঁটি সাধুতার মতই সে দুষ্প্রাপ্য। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন পরিতোষের মতো আপাদমস্তক শয়তান লোক সংসারে থাকা সম্ভব নয়। লেখক নিজের ইচ্ছামত চরিত্রটিকে সাজিয়ে দিয়েছেন। তিনি রবিবাসরিক খ্রীষ্টান স্কুলের হেড মাস্টারের মতো লোকশিক্ষার জন্যে এমন চরিত্র তৈরী করে মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা যায়, তিনি তাঁর সমালোচনায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি। আসলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আলোকপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোয় জীবনকে দেখার ফলে লঘুগুরুর অবলম্বিত সমাজটা আর গণিকা উত্তম-পরিতোষ প্রভৃতি চরিত্রকে বাস্তবোচিত মনে হয়নি। সেই বিষয়ে বিরূপ সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বিষয় ছেড়ে বিষয়ের স্রষ্টাকেও কিছুটা সমালোচনা করেছেন। স্বভাবতই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে জগদীশবাবু তাঁর 'উদয় লেখা' গল্প সংকলনের মুখবন্ধে স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন—

■ ''... লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে 'স্বভাবসিদ্ধ ইতর' এবং 'কোমর বাঁধা শয়তান' নিশ্চয়ই আছে, এবং বোলপুরের টাউন-প্ল্যানিংয়ের দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারিতে হয় নাই, 'ও জায়গা' আপনি চোখে পড়িয়াছে।''[১৯]

■ ''... পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবনকথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ, উহা সমালোচকের 'অবশ্য-দায়িত্বের বাইরে' এবং তাহার 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' ছিল না।''[২০]

■ ''... বিচার্য বিষয় ছাড়িয়া তাহা বিপথগামী হইয়াছে অর্থাৎ আসামীকে ত্যাগ করিয়া তাহা আসামীর নির্দোষ জনককে আক্রমণ করিয়াছে।''[২১]

আসলে শান্তিনিকেতনের আলোকিত পরিবেশের বাইরে বোলপুরের আরেকটা অন্ধকার জীবন ছিল। সেই জীবনের গলিপথে জগদীশবাবু নিয়তই হেঁটেছেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

করেছেন। আদালতের টাইপিস্ট হিসেবে অমন ইতর ও কোমর বাঁধা শয়তান প্রায়ই দেখতে পেতেন। বিশ্বম্ভর যেমন বাস্তব, তেমনি আগাগোড়া অসৎ ও প্রবঞ্চক পরিতোষও মিথ্যা নয়। মিথ্যা নয় উত্তমের অন্তরস্থ গৃহী সত্তা। আর তিনি তো যূথী-বনমালা হয়ে উত্তমের একটা ক্ষীণ অতীতের পরিচয় দিয়েছেন, যেখানে গেলেই আমরা বুঝতে পারি, সেই যূথীর শত্রু ছিল মানুষ; যেমন টুকীর শত্রু অচিন্ত্য। স্বভাবতই একেবারে স্বতন্ত্র ধারার লেখক হিসেবে জগদীশবাবুর চোখে সেই জীবনের ছবি অংকন অস্বাভাবিক ছিল না। উপরন্তু ব্যক্তিগতভাবে শৈশবেই তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় হয়েছিল গিরিবালা নাম্নী গণিকার। তাই এই সমাজ পরিবেশ 'সাত-সমুদ্রপারের বিদেশ নয়'। চরিত্রগুলি 'চমক লাগানো অলংকার' নয়, বরং দূষিত রক্তের আধিক্য পুষ্ট রক্তমাংসের মানুষ। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই 'লঘুগুরু'র ইতিবাচক মূল্যায়ন করেছেন—

''... কাম্য বিষয়ের স্পষ্টতায় এবং স্পষ্ট কামনার সঙ্গে প্রাক্তনের কর্মফলের সংঘাতে ব্যক্তির চূর্ণীকৃত রূপ রচনায় 'লঘুগুরু' অনুপম।''[২২]

এইভাবে জগদীশবাবু সম্পর্কে তাই পুনর্মূল্যায়নের সময় এসেছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যাবতীয় বিরূপ সমালোচনার 'গৌরচন্দ্রিকা' করেছিলেন লেখকের কলমের প্রশংসা করেই—

''... 'লঘুগুরু' বইখানা পড়ে দেখলুম। লেখবার ক্ষমতা তার আছে, একথা পূর্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েছি।''[২৩]

এখানেই রবীন্দ্রনাথের মহানুভবতা আর জগদীশ গুপ্তের অনন্যতা।

■ **শরৎচন্দ্র ও জগদীশ গুপ্ত :**

জগদীশগুপ্তের 'রোমন্থন' উপন্যাসের 'মুখবন্ধে' শ্রী রাবীন্দ্রকুমার ঘোষ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের শতচন্দ্র-প্রভায় বাঙালীর মন-প্রাণ যখন আলোচিত সেই সময়ই 'নভোমণ্ডল খচিত' করে জগদীশবাবুর আবির্ভাবের কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত তিনি জগদীশবাবু আর শরৎচন্দ্রের তুলনা টেনে স্পষ্টতই জানিয়েছেন—

''... জগদীশ শরৎচন্দ্রেরই গোত্রজ, তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র। এই বস্তুতন্ত্র সংসারের

সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, কামনা-বাসনার পাঁকে মধু-গন্ধ সুরভিতে অনুপম পদ্ম ফুটিয়ে তোলবার শিল্পী এঁরা। আকাশের আলো যে ধরিত্রীরই অন্ধকারের গর্ভজাত সন্তান, সত্য ও সুন্দর যে মিথ্যা ও অসুন্দরের ত্বকে ঢাকা সুমিষ্ট অমৃতফল, তা এঁরাই মনোজ্ঞ করে মানুষকে দেখিয়েছেন। এই সুন্দরের জগতে পাপ-পুণ্য নাই, আছে জগৎ স্রষ্টার অভিনব নব নব রস আর তার বিচিত্র ভিয়ান।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকেরা। কারণ তাঁদের বক্তব্যই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করা। এবিষয়ে বুদ্ধদেব বসু একজন একনিষ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত হয়েও প্রচণ্ড রবীন্দ্র বিরোধী ছিলেন। তিনি স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিলেন—

''যাকে 'কল্লোল' যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[২৫]

স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা শরৎচন্দ্রের রচনার মধ্যে পেয়েছিলেন তাঁদের স্বকীয় সাহিত্যাদর্শের বীজ। এই শরৎচন্দ্রের সঙ্গেই কল্লোলদের তুলনায় খানিকটা বয়সে বড় জগদীশবাবুর সাহিত্যের সাযুজ্য খুঁজেছেন শ্রী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। শরৎচন্দ্রের সমকালে শরৎচন্দ্রের রচনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও জগদীশবাবু কোন অবস্থাতেই শরৎচন্দ্রের মানসপুত্র নন, নন তাঁর গোত্রজ। বরং বিশ্লেষণে দেখা যায় দুইয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। জগদীশ বাবুর সাহিত্য দৃষ্টিতে আছে এক ভবিতব্য ভারাতুর নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা, সেখানে শরৎসাহিত্য সম্পূর্ণ এর বিপরীত মেরুর। সেদিক থেকে এই দুই শিল্পীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল—

■ শরৎসাহিত্য মূলত রোমান্টিসিজমের ভাবালুতায় আচ্ছন্ন; তিনি বাঙালী পাঠকের হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত করে সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে তাদের কাঁদিয়েছেন। কিন্তু সেদিক থেকে জগদীশবাবু নির্মম, নির্লিপ্ত, উদাসীন। আবেগ এসে তাঁর রচনায় পৌঁছনোর আগেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। তিনি মানুষের সুস্থতার আদর্শে নয়—বরং অসুস্থতা এবং আদর্শহীনতার ওপর অধিক আলো ফেলেছেন।

■ নারীকে মহীয়সী করে তুলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র গণিকার ভেতরেও সতীত্বকেই বড় করে দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে বাঈজিরা কখনো বাঈজি নয়, তাঁর ঝিয়েরা ঝি নয়, তাঁর

দিদিরাও কখনো দিদি নয়; কিন্তু সকলেই একটা অন্য কিছু হয়ে সার্থক হতে চেয়েছে। বৌদিরা মায়ের মতো, জ্যাঠাইমা গুরুমা আর মেসের ঝি হয়েছে আদর্শ প্রেমিকা। সাবিত্রী, কিরণময়ী রাজলক্ষ্মী, কমল—এইসব নারী চরিত্র শেষপর্যন্ত কেউই আর বাস্তব পৃথিবীর মাটিতে পা রাখেনি। সকলেই হয়ে উঠেছে মহিষী। নারী নির্যাতনের কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত তাদের তিনি এক অলীক চেতনার জগতে নিয়ে গেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ড. সরকার আবদুল মান্নান লিখেছেন—

''... নারী নির্যাতন দেখিয়েই তিনি নির্যাতিতের প্রতি করুণা প্রদর্শন ও তাদের ভালত্ব প্রচার করতে চেয়েছেন, কিন্তু নিপীড়কের প্রতি ঘৃণার ভাব সৃষ্টি তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল না। শুধু তাই নয় সামাজিক নিপীড়নের কার্যকারণ সম্পর্কটি সমাজের যে গভীর কন্দরে লুকিয়ে আছে, যে ঐতিহাসিক ধারাক্রম এর পশ্চাতে জলসিঞ্চন করে এসেছে তার সন্ধান তিনি দেননি।''[২৬]

অন্যদিকে জগদীশবাবুর উপন্যাসে নারীর জীবন যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তা মূলতঃ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পেষণেই হোক আর নারীদের ভাগ্য দোষেই হোক, সেসব তিনি খুব নির্মোহ দৃষ্টিতে বর্ণনা করেছেন। তাদের অকারণে মহীয়ষী করে তোলেননি। 'লঘুগুরু'র উত্তম-সুন্দরী-টুকী, 'নন্দ আর কৃষ্ণা' উপন্যাসের কৃষ্ণা কিংবা 'গতিহারা জাহ্নবী'র কিশোরী থেকে শুরু করে 'তাতল সৈকতে'র শরৎ, 'মহিষীর জ্যোতির্ময়ী, 'সুতিনী'র রাজবালা, সকলেই রক্তমাংসের নারী হয়েই আছে। এবং তাদের পরিণতি যাদের কারণে তারাও চিহ্নিত হয়েছে। কেবলমাত্র 'কলঙ্কিত তীর্থ' উপন্যাসের মাখন প্রথমাবধি জীবন্ত নারী চরিত্র, কিন্তু শেষাংশে সে হয়ে উঠেছে আদর্শায়িত নারী যা জগদীশগুপ্তের স্বভাব জাত নয় বললেই চলে। অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই প্রতিভার দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে স্পষ্টতই লিখেছেন—

''... শরৎচন্দ্রের কাছে পতিতার সমস্যা বলে কিছু ছিল না। পতিতারা সাধু রমণীমাত্র এই কথাটুকুই ছিল শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। তাদের শ্রেণী বা ব্যক্তি কোন রূপকেই শরৎচন্দ্র ধারণ করতে চাননি, করেন নি। এইসব রমণীদের মধ্যে আছে প্রেম এবং প্রেমেই সবশুদ্ধ, সতীত্ব অপেক্ষা নারীত্ব অনেক বড় কথা, এই ছিল মোটামুটি শরৎচন্দ্রের বক্তব্য। উত্তমের সাহায্যে জগদীশবাবু দেহজীবিণী এক নারীর গোটা জীবনের বাসনার সমস্যাকে রূপদান করেছেন।

শরৎচন্দ্রের মত সহানুভূতির প্রশ্ন জগদীশ গুপ্তের মুখ্য প্রশ্ন ছিল না।"[২৭]

এখানেই শরৎচন্দ্রের বিপরীতে জগদীশগুপ্তের অনন্যতা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জগদীশবাবু তাঁর কালে কোনরকম পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে পারেননি।

'লঘুগুরু'র সমালোচনাসূত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক সংঘাত দেখা দিয়েছিল তেমনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত, অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিগত মেরুকরণ দেখা দিয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটির জগদীশ গুপ্ত কর্তৃক সরাসরি দীর্ঘ সমালোচনার মধ্যদিয়ে। এটিকে শুধু একটা গ্রন্থ সমালোচনা না বলে দু'জন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সার্বিক মেরুকরণ বলা যায়। 'শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়' নাম দিয়ে জগদীশবাবু একেবারে অধ্যায় পরিচ্ছেদ চিহ্নিত ক'রে শরৎসাহিত্যের মূল আকর্ষণ যে চিত্ত বিনোদিনী আবেগ ঘনতা সৃষ্টি সেটা জগদীশবাবু কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। সেই সমালোচনা সূত্রেই উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের অসংযত খণ্ডিত জীবনবোধ এবং সঙ্গতিহীন শিল্পক্রিয়ার নির্মম বিশ্লেষণী প্রতিক্রিয়া। পরিবর্তিত এই পাঠক-প্রতিক্রিয়ায় জগদীশবাবুর ক্ষুরধার দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা শরৎসাহিত্য কেবল আক্রান্ত হয়েছে তাই নয়, শরৎচন্দ্রকে প্রকারান্তরে এমন যুক্তি শৃঙ্খলাহীন আবেগ সর্বস্ব উপন্যাস বাঙালী পাঠককে উপহার দেওয়ার জন্যে জগদীশবাবু কয়েক ধাপ এগিয়ে ধাপ্পাবাজের দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি সমালোচনার এক জায়গায় লিখেছেন—

"... রাখালরাজ ভক্তি ভ'রে সবিতার সর্বাঙ্গে যত মর্যাদাই নিরীক্ষণ করুক, আর, মা মা আহ্বান যতই ধ্বনিত করুক আর সারদা যত উৎসাহ লইয়াই রাখালের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাক শরৎচন্দ্র সবিতাকে মর্যাদা দিয়া ফুটাইয়া তুলেন নাই সজ্ঞানে কিংবা অজ্ঞাতে আমাদের ধাপ্পা দিয়াছেন।"[২৮]

শরৎচন্দ্রের তুলনায় জগদীশবাবুর ভিন্নমুখী প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করা যায় জগদীশবাবুর গ্রামীণ জীবনভাবনার ফসল ত্রয়ী উপন্যাস—'রোমন্থন-দুলালের দোলা যথাক্রমে'-র মধ্যদিয়ে। এই উপন্যাস তিনটিতে তিনি যে গ্রাম সমাজের চিত্রাঙ্গন করেছেন তা শরৎচন্দ্রের 'রেঙ্গুনে' বসে দেখা স্মৃতিমেদুর গ্রামজীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। লেখকের

ব্যক্তিগত জীবনে কুষ্ঠিয়ার গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা তাকে এমন দূষিত গ্রামের চিত্রাঙ্গণে সহায়তা করেছিল। শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রামের অবক্ষয়, সোনালী অতীত আর অবক্ষয় থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে শাসকের মানসিকতার পরিবর্তন আর জ্ঞানের আলো জ্বালানোর কথা বলেছিলেন। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে জ্যাঠাইমার রমেশের উদ্দেশ্যে আহ্বানের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, 'শুধু আলো জ্বেলেরে বাবা'। কিন্তু এই ভাবনা নিছক পানা পুকুরে সাময়িক ঢেউ তোলার মতোই ক্ষণস্থায়ী। যে পল্লীসমাজ গঠনের স্বপ্ন শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন আজ শতবর্ষের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই গ্রাম এখনও অধরা। যদিও রাস্তাঘাট পাকা হয়েছে এবং বৈদ্যুতিক আলো পৌঁছে গেছে দূর-দূরান্তের গ্রামেও। গ্রামের লেখাপড়া জানা সন্তানদের বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করে গ্রামেই ফিরতে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু জগদীশবাবুর উপন্যাসে আমরা দেখি গ্রামীণ জীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ডাক্তার নিত্যপর্দার শেষ পরিণতি। কিংবা 'রোমন্থনে' তিন শহরবাসী ভাইয়ের গ্রাম সম্পর্কে রোমান্টিক ধারণাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। 'দুলালের দোলা'র পিরু চরিত্রটির কথনের দ্বারা তিনি গ্রাম জীবনের নগ্ন বাস্তবতাকে অকৃত্রিমভাবে তুলে এনেছেন। এইসব গ্রামজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে জগদীশবাবুর মৌলিকতা কতটা সে বিষয়ে সমালোচক ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন—

''... পল্লী সমাজের রীতি-নীতি বিষয়ক যে তথ্যগুলি তিনি পরিবেষণ করেছেন, সংবাদ হিসাবে তার অনেকগুলিই আমাদের জানা ছিল কিন্তু বাস্তব চিত্রণে সেগুলি আমাদের সামনে অবিকৃতভাবে উপস্থিত করতে তাঁর পূর্বে কাউকে দেখি না। পল্লী চরিত্রগুলি সম্বন্ধেও একই কথা। তারা আছে জানতাম, কিন্তু এমনভাবে পল্লী গ্রামের সোঁদা গন্ধ নিয়ে, ধুলো কাদা মেখে মুখোসহীন অকৃত্রিমতায় সাহিত্যে তারা এর আগে কখনো আসে নি। নাগরিক চরিত্রের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য, তারা সহজবোধ্য। সমস্ত লালসা, নীচতা এবং স্বার্থপরতা নিয়েও তারা জটিলতা বর্জিত। তাদের সঠিকভাবে চিনে নিতে খুব বেশী সময় লাগে না। জগদীশ গুপ্ত এইসব চরিত্রের আপাত সারল্যে অভিভূত হননি, নীচতা এবং স্বার্থপরতায় মনকে বিষিয়েও তোলেন নি—দূরে দাঁড়িয়ে নিরাসক্ত দর্শকের মত মোহ বিমুক্ত দৃষ্টিতে জটিলতা বর্জিত এই চরিত্রগুলির স্বার্থপরতা ঢাকবার ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করেছেন এবং সকৌতুকে তা সাহিত্যে

পরিবেষণ করেছেন।"[২৯]

এখানেই জগদীশবাবুর অনন্যতার পরীক্ষা হয়ে যায়।

■ **কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক ও জগদীশ গুপ্ত :**

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যে নবত্ব' নিবন্ধের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের 'ওরিজিন্যালিটির ' মানদণ্ড নির্ণয় প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

''বড়ো সাহিত্যের একটি গুণ হচ্ছে অ-পূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে। এই তার কাজ। এ'কেই বলে ওরিজিন্যালিটি। যখনই সে আজগুবিকে নিয়ে গলা ভেঙ্গে মুখ লাল করে, কপালের শিরাগুলোকে ফুলিয়ে তুলে ওরিজিন্যাল হতে চেষ্টা করে তখনই বোঝা যায় শেষ দশায় এসেছে। জল যাদের ফুরিয়েছে তাদের পক্ষে আছে পাঁক। তারা বলে, সাহিত্য ধারায় নৌকা চলাচলটা অত্যন্ত সেকেলে; আধুনিক উদ্‌ভাবনা হচ্ছে পাঁকের মাতুনি—এতে মাঝিগিরির দরকার নেই—এটা তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি।"[৩০]

খুব অপ্রিয় হলেও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক ধারণার এই চিত্রকল্পের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কল্লোল গোষ্ঠীর সেদিনের হইচই করা সাহিত্য রচনার আসল ভবিষ্যৎ। রবীন্দ্রনাথ থেকে স'রে আসতে হবে, রবীন্দ্রনাথের প্রবল বিরোধিতা করতে হবে—মূলতঃ এটাই ছিল কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের প্রধান শ্লোগান। মজার ব্যাপার এরা গোপনে কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন; কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ যাতে না পায় তার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন। এমনই এক গোপনতম শ্রদ্ধার কথা উচ্চারণ করেছেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক' প্রবন্ধে—

''... এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেইসব তরুণ লেখক, যাঁরা সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত; অন্ততঃ একজন যুবকের কথা আমি জানি, যে রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাগলের মতো 'পূরবী' আওড়াতো, আর দিনের বেলায় মন্তব্য লিখতো রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ ক'রে।"[৩১]

বলাবাহুল্য এই যুবক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু নিজেই। তবে এই গোপন শ্রদ্ধা বা প্রকাশ্য আক্রমণ

যাই থাক না কেন, সেদিন 'কল্লোল গোষ্ঠী'র তরুণ তুর্কীদের আদর্শ হয়ে উঠেছিল শরৎচন্দ্র। কারণ শরৎসাহিত্যেই তাঁরা পেয়েছিল তাঁদের নিজস্ব সাহিত্যার্শের বীজ—যা তাঁরা রবীন্দ্রনাথে পায় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে তাঁরা নেমেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত জনতার মিছিলে। এই প্রভাবের কথা তারাশংকরও স্বীকার করেছেন। এবং পরবর্তী সময়ে তাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন জানিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের স্বীকারোক্তি ছিল—

''মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে 'কল্লোল' ডিঙিয়ে 'বিচিত্রা'য় চলে এসেছে—পটুয়া টোলা ডিঙিয়ে পটল ডাঙায়। আসলে সে 'কল্লোলেরই' কুলবর্ধন। তবে দুটো রাস্তা এগিয়ে এসেছে বলে সে আরো ত্বরান্বিত। কল্লোলের দলের কারু-কারু উপন্যাসে পুলিশ যখন অশ্লীলতার অজুহাতে হস্তক্ষেপ করে তখন মানিক বোধহয় শুক্তিমগ্ন।''[৩২]

এইভাবে প্রভাব আত্মস্থ করে, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে কল্লোলীয়রা স্বতন্ত্র সাহিত্য ধারা সৃষ্টির প্রয়াসে নেমেছিলেন। বাস্তবতার দাবী মেনে পাশ্চাত্যের রিয়ালিটির কারি পাউডার মাখিয়ে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখলেন 'বেদে' উপন্যাস যাতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অকৃতার্থ মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথা। কলকাতার রাজপথ ছেড়ে গলিপথ দিয়ে যেতে যেতে বস্তি জীবনের ছবি তুলে আনলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'পাঁক' উপন্যাসে। এই পথেই এলেন মণীশ ঘটক, গোকুলচন্দ্র নাগ, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশংকর সহ আরো অনেকে। তাঁদের সাহিত্যের প্রধান বিষয় হয়ে উঠল—সমকালের রাজনীতি, শ্রমিক জীবনের কথা, বস্তি ও গণিকা পল্লীর নগ্ন জীবনকথা, শহর-শহরতলির মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক জীবনের অনুষঙ্গ হিসেবে বিধবাদের জীবনকথা, দাম্পত্য জীবন সংকট সহ মানুষের যৌনতার কদর্য ঘাঁটাঘাঁটি পর্যন্ত। ফলে খুব দ্রুত সেই সাহিত্য ধারায় 'জল শুকিয়ে গিয়ে' নৌকো চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। দেখা দিল 'পাঁকের মাতুনি', 'তলিয়ে যাওয়া রিয়ালিটি'। ফলে ধীরে ধীরে কল্লোলীদের সৃষ্টি প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এল।

কল্লোলীয়দের চেয়ে খানিকটা বয়সে বড় জগদীশ গুপ্ত যদিও 'কল্লোল-কালিকলমে'র লেখক বলে পরিচিতি; তবুও কল্লোলের সঙ্গে তাঁর সেই অর্থে কোনদিন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি—যেটা 'কালি-কলম'-এর মুরলীধর বসুর সঙ্গে গড়ে উঠেছিল। নরেশ সেনগুপ্তের

মত কল্লোলীয়রা দেহচেতনার কথা যেভাবে সরাসরি তুলে এনে আরোপ করেছেন তাঁদের গল্পে, জগদীশ গুপ্তে জীবনের এতো অন্ধকারময়তা সত্ত্বেও কিন্তু যৌনতার কোনোরকম উত্তাপ নেই। এহেন কল্লোলকালীন, অথচ কল্লোল থেকে দূরের প্রতিভা সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক লিখেছেন—

''... মানুষের প্রবৃত্তি জগতের হিসেব নিলে বাৎসল্য যেমন সত্য, নিষ্ঠুরতাও তেমনি সত্য। নিষ্ঠুরতার চেয়ে বাৎসল্য মহত্তর বৃত্তি কেন এক নৈয়ামিকের কাছে তার কোনো যুক্তি নেই। প্রশ্নটা নৈতিকতার নয়, প্রশ্নটা বাস্তবিকতার। মানুষ বাস্তবিক কোন ধরণের জীব এটা যাচাই করতে গেলে ভাল-মন্দর বাই নিয়ে নীতিবাগিশ হওয়া চলে না। সাহিত্যিক গির্জার ফাদারও নন, স্কুলের হেড মাস্টারও নন, কাজেই নীতিবুলি কপচানোর চাইতে মানুষ যা সেই ভাবেই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। মনে হয় মানুষ এবং মানুষের মনের ভিতরের যত অন্ধকার এবং কালিমা সবই টেনে বের করে এনে তিনি তাঁর সাহিত্য জগৎটি অন্ধকারে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন।''[৩৩]

এইভাবে জীবনের অন্ধকার গলিপথে বিচরণ করে জগদীশবাবু মানুষের নীচতা, ক্রুরতা, খলতা, পরশ্রীকাতরতা, লোলুপতা, অন্ধ-প্রতিযোগিতা, বীভৎস যৌনতা ইত্যাদি তুলে এনেছেন। আচরণের আর আচরণের আড়লের মানুষের স্বরূপকে, নিয়তির লাঞ্ছনাকে একের পর তুলে এনেছেন তাঁর উপন্যাসে। এই যে চোখে দেখা জীবন অভিজ্ঞতা তাতে কোনো কৃত্রিমতা, কিংবা আরোপিত দুঃখবাদ, যৌনতা, রবীন্দ্র বিরোধিতার ধুঁয়া এসব কিছু ছিল না। এখানেই কল্লোলীয়দের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। তাঁর প্রতিভার এই দিকটি সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকদের মধ্যে দু'একজনের অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে—

■ ''জগদীশচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) শৈলজানন্দের মতোই জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী এবং ইঁহার গল্পেও প্রকৃতিকতাই পরিস্ফুট। ... মানুষের দৈন্যতা-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক 'আধুনিক' লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই। শৈলজানন্দের মতো নির্লিপ্ত ভাবে ছবি আঁকিয়াই যান নাই।''[৩৪]

— ড. সুকুমার সেন

■ ''... জগদীশগুপ্ত অবিশ্বাসী; তাহলেও বিশ্বাসহীন নন তিনি। অর্থাৎ সৌন্দর্য, কল্যাণ ও সত্য সম্পর্কে মানুষের যুগ-যুগ প্রচলিত নীতিচেতনার প্রতি এক মৌলিক অবিশ্বাসে জগদীশ গুপ্ত একান্ত বিমুখ। এই বিমুখতা তার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। ফলে জীবন সম্পর্কিত সকল নীতিবোধ ও কল্যাণমূলক মূল্যমানকে কেবল অস্বীকার করেই তিনি তৃপ্ত নন। বিশ্বপ্রবাহের মূলে এক অমোঘ শক্তির অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন, যা একান্তরূপে বিনাশক—ক্রূর এবং কদর্য।''[৩৫]

—অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

■ ''শিল্প-সাহিত্যে মানব-প্রবৃত্তির রহস্য উন্মোচনের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে আবিভূত হয়েছিলেন জগদীশ গুপ্ত। তিনি যে সমাজের মানুষ সেই সমাজ ছিল অসুস্থ-দরিদ্র ক্ষয়িষ্ণু, সঙ্গত কারণেই অনেকাংশে এই সমাজের মানুষ ও তার মন ছিল না সুস্থ ও সুন্দর। তাই তাঁর সাহিত্যে যখন এই মনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে অগ্রসর হলেন দেখলেন সেখানে অন্ধকার, গলিত, বীভৎস একরূপ।''[৩৬]

—আবুল আহসান চৌধুরী।

এইভাবে কল্লোলের সাহিত্য যখন 'পাঁক বন্দী' হয়ে পড়ছিল, জগদীশবাবু অন্ধকার নদীস্রোতে নৌকায় শক্তহাতে হাল ধরে এগিয়ে গেছেন। তাঁর সেই অন্ধকার চর্চার ভেতরেই খুঁজে দেখলে পাওয়া যাবে উত্তরণের সূত্র। তিনি ইচ্ছাপূরণার্থে কোনো সস্তা রোমান্টিসিজমের পাউডার দিয়ে তাঁর শিল্প প্রতিমাকে কলুষিত করেননি। হয়তো একারণেই তাঁকে ঘিরে সচেতন ও সংবেদনশীল পাঠকের অনুসন্ধান থেমে নেই।

■ **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্ত :**

বয়স এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব কালের বিচারে জগদীশ গুপ্ত ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছুটা অগ্রবর্তী। একজন কল্লোলীয়দের চেয়ে কিছুটা বয়ঃজ্যেষ্ঠ আর আরেকজন 'কল্লোলেরই কুলবর্ধন'। এই দুই প্রতিভার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

''... জগদীশ গুপ্ত এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাস পড়ে সব সময়েই মনে হয়, শরৎচন্দ্রের আবেগ পুষ্ট বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন আস্বাদ পাচ্ছি—কিন্তু কখনো একথা মনে হয় না যে, বিদেশী উপন্যাসের নায়কদের চলন বলন, মননকে ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়ে হাজির করা হচ্ছে। কেন না তাঁরা তাঁদের শিল্প কর্মে যে অভিজ্ঞতার রঙ লাগিয়েছিলেন সেটা আসল রঙ। তাকে তাঁরাই খুঁজে বের করেছিলেন নিজ নিজ অন্বেষার টানে।''[৩৭]

তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম মানিককে সাধারণত বিচার করা হয় ফ্রয়েড আর মার্কসকে সামনে রেখে। লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়ে তিনি ছিলেন ফ্রয়েডের শিষ্য আর উত্তরকালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে মার্কসের শিষ্য। কিন্তু এভাবে ব্যক্তিগত জীবন ধারা প্রবাহিত হলেও তাঁর সৃষ্টি প্রবাহে পুরোপুরি এরকম মেরুকরণ ঠিক সমীচীন নয়। অর্থাৎ ফ্রয়েড আর মার্কসীয় ভাবনাকে সামনে রেখে তিনি দুটি পৃথক ধারা বজায় রেখেছেন সাহিত্য রচনায়—এমনভাবে বলাটা সঙ্গত নয়। বরং বলা যায় তিনি তাঁর ভাবনাকে সমৃদ্ধ করার জন্য এঁদের প্রভাব আত্মস্থ করেছেন, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় নিজের মতো করে প্রয়োগ করেছেন। যেকারণে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র মতো উপন্যাসের জন্য কমিউনিস্ট সমালোচক শীতাংশ মৈত্রের আক্রমণের মুখে পড়ে উপন্যাসটি সম্পর্কে 'আত্মসমালোচনা' করতে গিয়ে লেখক ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। শীতাংশু মৈত্রদের সমালোচনায় জবাবে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, এই বইয়ের মানুষগুলি নিয়তির হাতের পুতুল নয়; বরং যারা মানুষকে পুতুলের মতো নাচায় তাদের বিরুদ্ধে দরদী প্রতিবাদ। যদিও এরকম কোনো প্রতিবাদ উপন্যাসে নেই। তাই বলা যায় তিনি বিশেষ কোনো মতাদর্শের গণ্ডীতে আবদ্ধ থেকে তাঁর জীবনের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি লেখেন নি। যখনি তিনি পুরোপুরি 'ইজমের' দাসত্ব শুরু করেছেন তখনি তাঁর অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর শারীরিক রোগশোক আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আনুষঙ্গিকভাবে বৈজ্ঞানিক সমাজবোধ আর একপ্রকার আধিভৌতিক বিশ্বাসে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়া। তবে আদিপর্বের উপন্যাসগুলিতে, বিশেষ করে 'জননী' 'দিবারাত্রির কাব্য', পদ্মানদীর মাঝি আর পুতুলনাচের ইতিকথা'য় যে শিল্পী প্রতিভার বিচ্ছুরণ আছে তার দ্বারাই মানিককে অনায়াসে চিনে নেওয়া যায়।

বিজ্ঞানের ছাত্র মানিকের সৃষ্টি ধারার প্রথমদিকে একটা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল। যার ফলে সেই সময়ের সাহিত্যে মানুষের নিরুপায়ত্বের কথা থাকলেও তাদের হেরে যাওয়া নেই। বিশেষ করে 'পুতুলনাচের ইতিকথায়' নিয়তির প্রভাব থাকলেও নায়ক শশীর জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়নি। কেবল কুসুমের সঙ্গে তার সম্পর্কের চির বিচ্যুতি ঘটেছিল। এই বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল। কারণ তাদের ভিন্ন মানসিকতা। শশীর অন্বিষ্ট ছিল মন, কিন্তু সে ভুল মানুষের কাছে সেই মনের অন্বেষণ করেছে। কারণ কুসুম ছিল শরীর সর্বস্ব ক্ষুধার্ত নারী। শেষ পর্যন্ত সাড়া না পেয়ে সে চিরদিনের জন্য বাপের বাড়ী চলে গেছে। অন্যদিক থেকে দেখলে বলা যায় শশী ছিল শিক্ষিত মার্জিত কলকাতা আর কুসুম ছিল শিক্ষাদীক্ষা বর্জিত গাঁওদিয়া গ্রাম। ফলে এই দুইয়ের মিলন সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত শশী তালবনে টিলার উপর সূর্যাস্ত দেখতে না গিয়ে যাদবের রেখে যাওয়া অর্থে হাসপাতাল গড়ার কাছে আত্মনিয়োগ করেছে। ফলে শশী কুসুমের পরিণতিকে অনিবার্য বলা যায়।

জগদীশগুপ্তের উপন্যাসে, বিশেষ করে 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে নকল সিদ্ধার্থের রহস্য উন্মোচন, অজয়ার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়া; 'গতিহারা জাহ্নবী'র কিশোরীর আত্মিক মৃত্যু ঘটেছে, সে শুধু গর্ভের সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকবে; 'তাতল সৈকতে' উপন্যাসে শরৎ এর পরিণতি, 'মহিষী'তে জ্যোতির্ময়ীর পরিণতি, 'সুতিনী'তে রাজবালার পরিণতি, 'কলঙ্কিত তীর্থ'-এর প্রথমাংশে মাখনের পরিণতি এসবই যেন দৈব নির্ধারিত। এই দৈব দুর্বিপাকের ফলেই 'রতি ও বিরতি' উপন্যাসে তিনটি প্রাণের বিনাশ সাধিত হয়েছে। এই নিয়তি নির্ভরতার গল্পই ভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়েছে। ফলে দুই প্রতিভার রচনার পরিণতি সম্পর্কে তাই বলা যায়, জগদীশ বাবুর বিষয় ছিল মানুষের নিঃসহায়ত্ব আর মানিকের ছিল নিরুপায়ত্ব। মানিক শেষপর্যন্ত হারেন নি। জগদীশবাবু হারলেও কিন্তু তিনি পুরোপুরি নৈরাশ্যবাদী নন। কারণ তিনি মানুষ গুলির এই করুণ পরিণতির পশ্চাতের কারণটি নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে উত্তম - টুকী- কিশোরী- শরৎ -জ্যোতির্ময়ী - রাজবালা-মাখন—এরা শাস্তি ভোগ করে। কিন্তু এই পরিণতির যারা কারিগর সেই বিশ্বম্ভর পরিতোষ - অকিঞ্চন- অশোক -সাতকড়ির কোনো শাস্তি হয়নি। এই সব মানুষকে কঠোর

শাস্তি দিতে পারলেই ওইসব নারীদের জীবন সমস্যার কিনারা হয়ে যাবে। তাই তো মানিক প্রতিভা যখন শেষপর্যন্ত সমস্যার বাধা পেরিয়ে পৌঁছে যায় গন্তব্যে, জগদীশ বাবু তখন তাঁর বিরল প্রতিভা নিয়ে গুটিপোকার মতো ঘুরে বেরিয়েছেন। বের হবার পথ পাননি। 'কল্লোলের কুলবর্ধন' হলেও মানিকের সঙ্গে কল্লোলীয়দের বিস্তর পার্থক্য তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—

''মানিকের মানসিকতা গঠনে 'কল্লোলের' প্রভাব অনেকখানিই পড়েছিল, কিন্তু তা যুক্তিহীন ভাবে নয়; তাঁর বিজ্ঞানী বুদ্ধির সাহায্যে কল্লোলীয় আন্দোলনকে তিনি বিচারের মাধ্যমেই গ্রহণ করেছিলেন—নতুনত্বের চাঞ্চল্য বা আবেগের উন্মাদনা তাঁকে প্ররোচিত করতে পারেনি।''[৩৮]

এভাবেই ভাববাদী কল্লোলীয়দের থেকে সরে এসেছিলেন মানিক আর জগদীশবাবু কোনকালেই কল্লোলীয়দের সঙ্গে সেভাবে সংশ্রবই রাখেননি সেভাবে। শুধু তাঁর অন্তরস্থ তারুণ্যকে কল্লোলীয়রা বিশেষ কদর করতেন। যৌবন যে বয়সে নয়, মনের মাধুরীতে সেটা তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

মানিকের সঙ্গে জগদীশবাবুর এতো অমিল সত্ত্বেও দু'একটি বিষয়ে অদ্ভুত মিল ছিল। যেমন, মানিক তাঁর উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যদিয়ে যে সুগভীর জীবন দর্শন তা একেবারে গৌণ চরিত্রের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করিয়েছেন। পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কুসুমের বাবা অনন্তই কাহিনীর সারসত্যটি উচ্চারণ করে বলেছিল, 'সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।''[৩৯]

একইভাবে 'দুলালের দোলা' উপন্যাসের পিরু যেন লেখকেরই অভিন্ন সত্তা। সে নানা সময়ে কথা প্রসঙ্গে নীরদবরণকে জানিয়েছে—

''আমি ভেবে দেখেছি, বাবু, ধর্ম্মপত্নী, স'ধর্ম্মিণী আরো অনেক কথার এমনি মানে নাই। মন্তর মেয়েকে বাঁধার কৌশল, তার দেহটাই আসল।''[৪০]

কিংবা, ''... লোকে বলে, দশটার বেশী দিক্ নাই; কিন্তুক্ আমি বলি বাবু, হাজার দিক

আছে, পুণ্যের না থাক, পাপের আছে, আর হাজার দিকে মানুষের মন ছুটছে; তার না আছে ধর্ম্মজ্ঞান, না আছে নরকের ভয়।"[৪১]

আসলে এসব সত্যোপলব্ধি তাঁদের জীবন-অভিজ্ঞতা প্রসূত। এটা দু'জন লেখকই তাঁদের জীবন থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। এরই সাথে দু'জনেই আঞ্চলিক ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ যেমন করেছেন তেমনি বিশ্লেষণী বুদ্ধিতে দুজনেই সমুজ্জ্বল, দু'জনেই খুঁজে ফিরেছেন কার্যকারণ। এখানেই দুজনের অনন্যতা।

জগদীশ গুপ্তর অগ্রজ শরৎচন্দ্র আর মন্ত্র শিষ্য (ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব প্রয়োগের ক্ষেত্রে) মানিক দুজনেই তাঁদের কালে ভীষণ জনপ্রিয়তা-খ্যাতি-প্রশংসা লাভ করেছিলেন। কিন্তু জগদীশবাবুর সৃষ্ট চরিত্রের মতোই তিনি মন্দভাগ্যের অধিকারী। 'অন্তরালের কথাসাহিত্যিক', 'অনুপস্থিত লেখক', 'অনেকের কাছেই অদেখা' এই মানুষটি সুদীর্ঘ অর্ধশতক ধরে নীরবে নিঃভৃতে বসে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে তিনি মূলতঃ কবিতাই লিখে গেছেন। এইসময় তাঁকে মোহিতলাল মজুমদার লেখা ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন—

''লেখা এখন ছেড়ে দিন। এবয়সে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি কমে।"[৪২]

জীবনের চূড়ান্ত সৃষ্টিশীলতার অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে তিনি সমকালের 'কল্লোল' 'কালি-কলম', 'বঙ্গবাণী', 'বিজলী', 'উত্তরা', 'ভারতী', 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ', 'প্রবর্তক', 'সোনার বাংলা', 'জাগরণ', 'দীপিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার জন্য লেখা পাঠিয়েছেন সাম্মানিক দক্ষিণার জন্য কোনোরূপ আকাঙ্ক্ষা না রেখেই। এইসব পত্রিকা ছাড়াও বহু অখ্যাত পত্র-পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন। প্রায় কাউকেই কখনো বিমুখ করেননি। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁকে 'অনুপস্থিত' লেখক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। এর উত্তরে কিছুটা অভিমান ক'রে তিনি লিখেছিলেন—

''শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যবাবু ১৩৫৬/অগ্রহায়ণের পূর্বাশায় প্রকাশিত 'কল্লোল যুগ' প্রবন্ধে একটি অকপট সত্য অতিসুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। জগদীশবাবু সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণশীল অনেকের কাছেই 'অনুপস্থিত'। এই একটি শব্দ 'অনুপস্থিত' শব্দটি, আমার সঙ্গে পাঠকের যোগরেখা চমৎকার নির্বিকারভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। একটি শব্দের দ্বারা এতটা সত্যের উদ্‌ঘাটন

আমার পক্ষে ভয়াবহ হইলেও আনন্দপ্রদ। সরল ভাষায় কথাটার অর্থ এই যে, অনেকেই আমার নাম শোনেন নাই। কাজেই অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, যাহাদের কাছে আমি 'অনুপস্থিত' তাহাদের সম্মুখে আচম্‌কা লাফাইয়া পড়িতে আমি পারি না। লেখা পড়াইয়া সন্তোষবিধান ব্যতীত নিজের খবর আর তথ্য জানাইয়া তাঁদের কৃতার্থ করিবার দায়িত্ব নেই।"[৪৩]

'আত্মপ্রচার বিমুখ' আত্মাভিমানী লেখকের এই অভিমানী প্রকাশ স্বাভাবিক ছিল। নিজেকে 'ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ফলাইয়া' কোনকালেই প্রকাশ করতে ভালোবাসতেন না। লেখালেখি করেন জেনে বোলপুর টাউনে তাঁর সুহৃদ কানুবাবু-শ্রীব্রজজন বল্লভ বসু তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী' প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার নিয়েছিলেন। গ্রন্থটি প্রকাশের পর তাঁর লেখা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রবণ আলোড়ন হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করে বলেছিলেন—

"তোমার গল্পে নূতন রূপ ও রস দেখিয়া খুশী হইলাম।"[৪৪]

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা আরেক কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার ব্যক্তিগতভাবে জগদীশ গুপ্তের লেখা পড়ে এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, সেই পরিতৃপ্তি থেকে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে জগদীশবাবুর রচনাদি সংগ্রহ করেছিলেন নির্বাচিত করে ভূমিকা লিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার জন্য। কিন্তু মোহিতলালের অকাল মৃত্যুতে সেই চিন্তা বাস্তবায়িত হয়নি। জগদীশ গুপ্তের রচনাবলী প্রথম খণ্ডের পরিচায়িকায় একথার সমর্থন রয়েছে—

"মোহিতবাবু গুপ্ত মহাশয়ের অনেকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি রচনা নির্ব্বাচন করিয়া ভূমিকাসহ একখানি সংগ্রহ পুস্তক প্রকাশ করিবেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁহাকে হরণ করায় মোহিতবাবুর ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—পূর্ণ হইলে সাহিত্য জগৎ নূতনতর আলোকপাতে জগদীশবাবুর রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর ভাবে পরিচিতি এবং রচনা সম্পর্কে অধিকতর শ্রদ্ধায়ুত হইতে পারিত।"[৪৫]

আত্মকেন্দ্রিক এই মানুষটি তাঁর দুর্বিসহ জীবন যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকাকালীন খুব বেশী সম্মান ও স্বীকৃতি পাননি। এই বিষয়টি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। জীবন সায়াহ্নে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বদান্যতায় ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে মাসিক ১৫০ টাকা সাহিত্যিক ভাতা মঞ্জুর করেছিল। পরে অবশ্য সেই অর্থের পরিমাণ অর্ধেক অঙ্কে নেমে

এসেছিল। যাদবপুরের নিকটস্থ রামগড় কলোনীর ঘেঁষাঘেষি সংকীর্ণ আশ্রয়ে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি কেটেছে। লেখকের জীবদ্দশায় এই রামগড় কলোনীর প্রগতি সংঘের তরুণরাই একমাত্র লেখককে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল। আর কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাকে সম্মান জানায় নি সেভাবে। সেদিক থেকে প্রগতি সংঘের সেই প্রয়াস ধন্যবাদার্হ। ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ৫ই পৌষ রামগড়ে অনুষ্ঠিত সেই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তার টুকরোটি এরকম—

''সম্প্রতি যাদবপুরের নিকটবর্তী রামগড় কলোনীতে প্রগতি সংঘের সভ্যগণের উদ্যোগে এই কলোনীর অধিবাসী সাহিত্যিক শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্তকে একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। গুপ্ত মহাশয় আজীবন সাহিত্য সাধনা করিয়া জীবনের সায়াহ্নে উপনীত হইয়াছেন। বর্তমান সময়ে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর এবং দৃষ্টিশক্তি অতিশয় দুর্বল ও লুপ্তপ্রায়।....এই বৃদ্ধ সাহিত্যিককে রামগড় কলোনীর অধিবাসীগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রগতি সংঘের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শ্রীমতিলাল বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ... এতদুপলক্ষে বিভিন্ন বক্তা জগদীশবাবুর জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া জাতি সংগঠনে সাহিত্যের প্রভাব যে কত শক্তিশালী তাহা বর্ণনা করেন। জগদীশবাবুর পক্ষ হইতেও তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয় এবং তিনি কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।''[৪৬]

প্রগতি সংঘের এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলা যায় তাঁরা 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' কথাটিকে ভুল প্রমাণ করেছিলেন এই সম্মাননা জ্ঞাপন করার মধ্যদিয়ে।

জগদীশ গুপ্ত এরপর খুব বেশীকাল বাঁচেন নি। মৃত্যুর পর তাঁর চলে যাওয়াকে ঘিরে কোন শোকসভা বা কিংবা স্মরণসভা করা হয়েছিল কিনা তার কোনরূপ প্রমাণ নেই। তবে দু-একটি পত্রিকায় তাঁর মৃত্যু সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল বেং তারা কেউ কেউ স্বল্প পরিসরে লেখকের শিল্পী প্রতিভার বিষয়েও দু-চার কথা বলেছেন। তাঁর মৃত্যুতে 'শনিবারের চিঠি'তে একটি নিবন্ধ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল 'সংবাদ সাহিত্য' অংশে। এই নিবন্ধ-সংবাদ লিখেছিলেন সম্পাদক সজনীকান্ত দাস—এরকমই অনুমান করা হয়। সেই নিবন্ধে জগদীশবাবু সম্পর্কে

লেখা হয়েছিল—

''বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি যেকালের মানুষ সেকালের সাহিত্যিকদের সঙ্গে পথ চলিবার চেষ্টা করেন নাই, করিলেও পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। মধ্যবয়সে উপনীত হইয়া হঠাৎ তিনি এমন গল্পের সৃষ্টি করিলেন যে, 'কল্লোল' পত্রিকায় নূতনত্ব প্রয়াসী তরুণেরাও চকিত হইয়া উঠিলেন এবং জগদীশ গুপ্তকে বয়সে তরুণ-কল্পনা করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সময়ের অগ্রগামী তাহাকে বলিব না, গতানুগতিক পথে চলিতে চলিতে পরাজয়ের গ্লানিতে বোধহয় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়াই তিনি অভিনব পথ ধরিয়াছিলেন। ... তাঁহার মনের অন্তরালে যে জটিল গ্রন্থি ছিল, তাহা তাঁহাকে সাহিত্য সরণী হইতে বহুবার বিপথে লইয়া গিয়াছে, তবুও নতমস্তকে স্বীকার করিব কথাসাহিত্যে তিনি ওস্তাদ শিল্পী, জোরালো তাঁহার ভাষা, নিপুণ তাঁহার মানব চরিত্র চিত্রণ। তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও কাঠিন্যের মধ্যেও বেদনার ফল্গুপ্রবাহ রহিয়াছে। তিনি তাই বাঁচিয়া থাকিবেন।''৪৭

নিবন্ধটির প্রথমাংশে লেখক সম্পর্কে কিছুটা বিরূপ ভাবনা বা আংশিকতাদোষ দুষ্ট চিন্তা থাকলেও শেষে কিন্তু স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। লেখকের মৃত্যুতে এই রচনাটুকুই হয়তো প্রথম বিশেষ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সমকালের 'যুগান্তর' পত্রিকার (৪ঠা বৈশাখ, ১৩৬৪) সম্পাদকীয় কলমে জগদীশবাবুর মৃত্যু সংবাদের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্য প্রতিভার কিছুটা মূল্যায়নও করা হয়েছিল। নিঃসন্তান জগদীশবাবুর সৃষ্টিগুলিকেই তাঁর সন্তানরূপে উল্লেখ করেছিল এই পত্রিকা। সেই প্রকাশিত সংবাদের কিছুটা অংশ এরকম—

''প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত লোকান্তরিত হইয়াছেন এ সংবাদে সাহিত্যমোদী মাত্রেই ব্যথিত হইবেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলায় যে নূতন সাহিত্যিক দল দেখা দেন, বয়সে বড় হইলেও জগদীশ গুপ্ত ছিলেন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত—সে সমাজচেতনার দিক হইতেও, মননশীলতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক হইতেও। কল্লোল, কালি-কলম, বঙ্গবাসী প্রভৃতি তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলির মধ্যে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ এবং প্রথম আবির্ভাবেই

গুণীজনের সসম্মান স্বীকৃতির অধিকারী হন।”[৪৮]

জগদীশবাবুর সাহিত্য রচনার কালকে চিহ্নিত করে তাঁকে সসম্মান স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এই সংবাদে।

‘দেশ’ পত্রিকার (১৪ই বৈশাখ, ১৩৬৪) ‘সাময়িক প্রসঙ্গ’ অংশে জগদীশবাবুর রচনার মূল্যায়ন ক’রে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের অন্যতম পথিকৃৎ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিল—

‘‘বাংলা সাহিত্যের বোধকরি দুঃসময় আসিয়াছে, যাঁহাদের একনিষ্ঠ সেবায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শব্দ ঐশ্বর্য মণ্ডিত হইতেছিল তাঁহাদের অনেকেই একে একে বিদায় লইতেছেন। মাত্র ছয়-সাত মাসের মধ্যে মানিক, সুনির্মল দক্ষিণারঞ্জন, দীনেশচন্দ্রের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিককে আমরা হারাইয়াছি, সম্প্রতি জগদীশ গুপ্ত মহাশয়কেও হারাইলাম। তাহার পরলোক গমনে ক্ষতির পরিমাণ আরও অসহ্য হইয়া উঠিল। জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যের সহিত ইদানিংকার পাঠক সমাজের ঘনিষ্ঠতা হয়ত নাই, কারণ প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জনের যে সিধা সড়ক গুপ্ত মহাশয় তাহা হইতে দূরত্ব রচনা করিয়া সাহিত্য সেবা করিয়া গিয়াছেন।”৪৯ সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট এই মূল্যায়ন জগদীশবাবুর প্রাপ্য। বিশেষকরে একেবারে শেষে তাঁর সম্পর্কে অকপট সত্য ভাষণ উচ্চারিত হয়েছে।

অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক ড. ক্ষেত্র গুপ্ত একটি প্রবন্ধের সূচনায় (সাহিত্য ও সংস্কৃতি/কার্তিক-পৌষ সংখ্যা, ১৩৮০) জগদীশ প্রতিভার মূল্যায়ন করে লিখেছেন—

‘‘জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের একজন অবহেলিত লেখক। অথচ, কথাসাহিত্যে মনস্তাত্বিক জটিলতা উদ্ঘাটনে তিনি অতি দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃতের সম্মান তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু জীবৎকালে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান তিনি পান নি।... সতর্ক পাঠক জগদীশচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলী পাঠ করলে তাঁর বাইরের স্বল্পায়োজনে এবং অন্তরের অতি গভীর মানবিক সম্পদে বিস্মিত হবেন—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।”[৫০] ড. ক্ষেত্র গুপ্তের শেষ বাক্যেই রয়েছে জগদীশবাবুর প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়। তাঁর রচনা ফল্গুধারার মতো। উপর থেকে তার অন্তরঙ্গ গভীর ও ভয়ংকর স্রোত কল্পনা করা যায় না।

উত্তরকালে বাংলা সাহিত্যে যখন 'হাংরি প্রজন্মের মধ্যে নতুন পথ-অন্বেষণের জন্য সূচিত হয়েছে সাহিত্যে 'হাংরি জেনারেশন' বা 'ক্ষুধার্তদের আন্দোলন' ।সেই আন্দোলন কারীরাও জগদীশবাবুকে সম্মানের আসন দান করেছেন। মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, বিনয় মজুমদারদের এবং প্রথমাবধি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যয়দের সেই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যে যখন একটা 'নতুন বাঁক' সৃষ্টি হচ্ছে, পরে অশ্লীলতার কারণে, প্রশাসনিক পেষণে সেই আন্দোলন ছত্রভঙ্গ হয়েছে এই ইতিহাসের ধারাতেও জগদীশ গুপ্ত প্রেরণাদানকারী লেখক যে ছিলেন সেকথার সমর্থন পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গের হাংরি প্রজন্মের কবি অরুণেশ ঘোষের কথাতেও। তিনি 'জগদীশগুপ্ত : বাস্তবতার উত্তরাধিকার' — নামক এক স্বল্প পরিসরের প্রবন্ধের একজায়গায় লিখিছেন—

''জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে। আর সেটা সাহিত্য মহলে নয়, তরুণ লেখক ও পাঠকের মধ্যে। কারণটা কি খুব স্পষ্ট নয়? যখন চারপাশের সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক শূন্যতা অবর্ণনীয় তখন এমন একজন লেখকের লেখা থেকে প্রেরণা পেতে চায় একজন তরুণ লিখিয়ে যাঁর মধ্যে ভণ্ডামি নেই, যাঁর সত্যদৃষ্টির উপর অবস্থা রাখা যায়।"[৫১] আসলে সাহিত্যের গতি তো নদীর মতোই বাঁক নেয়, তেমনি একেকটা বাঁকে এসে পেছনের দিকে ফিরে তাকালে তরুণ প্রজন্ম তাদের ভাবনার সঙ্গে একেক জনের সাদৃশ্য খুঁজে পায় কিংবা তারা নিরন্তর খুঁজে চলে সেই প্রতিভাকে যাঁর সামনে নত হয়ে সত্যকে আত্মস্থ করা যায়। জগদীশ গুপ্তের প্রাসঙ্গিকতা আজও এখানেই।

সাম্প্রতিকালে সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে রাজীব চৌধুরী সম্পাদিত 'দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত' নামে দুটি পৃথক খণ্ডে বিন্যস্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দুটিতে জগদীশবাবুর দুষ্প্রাপ্য উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, নাটিকা ইত্যাদি সংকলিত হয়েছে। সংকলক ও সম্পাদক তাঁর গ্রন্থ নামের মধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন জগদীশবাবু আজ আর সহজলভ্য নন, তিনি দুষ্প্রাপ্য। প্রসঙ্গত তিনি সংকলনের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন—

'' 'দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত' এরকম নামের একটি সংকলনে লেখক জগদীশ গুপ্তের যে কয়েকটি উপন্যাস, বড়গল্প এবং ছোটগল্প একত্রে সংকলিত করা হল, সেগুলি যে বর্তমানে

সহজসভ্য নয়, সেই ইঙ্গিতটিই করতে চাওয়া হয়েছে এখানে। কিন্তু পরে ভেবে দেখা গেল যে এই মুহূর্তে কেন, দুদশকেরও বেশি সময় ধরে জগদীশগুপ্তের কথাসাহিত্য বাঙালি পাঠকের কাছে দুষ্প্রাপ্যই হয়ে উঠেছে বটে।... বাংলা গল্পের কয়েকটি সংকলনে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হবার সুবাদে লেখকের পরিচিত কয়েকটি গল্পের নামই ঘুরে ফিরে আসে।"[৫২]

রাজীব চৌধুরীর বক্তব্যে অপ্রিয় সত্যটুকুই বড় নির্মমভাবে উচ্চারিত হয়েছে। তবুও এরপরেও থাকে সচেতন পাঠক-গবেষকের সুতীক্ষ্ণ ইতিহাসবোধ আর জীবন দৃষ্টি। তাকে ধুসর ইতিহাসের পাতায় প্রায় বিবর্ণ হয়ে যাওয়া অধ্যায়কে পুনরায় লিখে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেই হয়। বাংলা কথাসাহিত্যের সেই ইতিহাসের ধারায় জগদীশ গুপ্তকে উল্লেখ না করে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস রচনা কোনোমতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে আজকের এই ইন্টারনেটের যুগে মানুষের জীবনে যখন গতিবেগ বেড়েছে, কমেছে আবেগ, তখন বাংলা উপন্যাসের ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব জগদীশবাবু নিঃসঙ্গ মানবাত্মার যথার্থ প্রকাশক। তার 'অসাধু সিদ্ধার্থে'র ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থ স্বামী প্রেম বঞ্চিতা কিশোরী-জ্যোতির্ময়ী কিংবা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা পূরণ করতে সুস্থ জীবন থেকে টুকী নাম্নী মেয়েটির অন্ধকারে নেমে যাওয়া—এসবই তো এই সময়ের সমাজ দলিল। সুতরাং জগদীশবাবুর পুনঃপাঠ অনিবার্য। তাকে বাংলা উপন্যাসের পথরেখায় একটা স্বতন্ত্র মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়—যেখানে সংবেদনশীল পাঠক এসে অন্ততঃ একবার থমকে দাঁড়ায়।

তথ্যসূত্র :

১. কল্লোল যুগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম প্রকাশ, ২০০২, পৃ. ১৪৮।

২. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, সম্পাদনা : কার্তিক ভদ্র, এস. ব্যানার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৭৪।

৩. সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, পঞ্চাশতম সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ৯১।

৪. পত্রগুচ্ছ, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., পৃ. ৬০৮।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২০।

৬. জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫৪।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

৮. দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৩১।

৯. ভিন্ন সন্ধান, ভিন্ন আঙ্গিক : উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত; জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য, সম্পাদনা : ড. সমরেশ মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৯২।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০।

১১. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩৮।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭।

১৩. আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৭২।

১৪. জগদীশ গুপ্ত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯।

১৫. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ৭২।

১৬. জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. ১৫৪।

১৭. জগদীশ গুপ্তের রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৬৩৭।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৪।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪১।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪০।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৭।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮।

২৫. রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, সাহিত্যচর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ. ১১১।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

২৯. বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ১৫২।

৩০. বিশ্বভারতী, পৃ. ৮৬।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫।

৩৩. বাংলা কথাশিল্পের কয়েকজন মগ্ন অবলোকন ও সামান্য বিচার, চারুলিপি, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৮৯।

৩৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫১।

৩৫. বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৩৬৯।

৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১।

৩৮. বাংলা গল্প বিচিত্রা, প্রকাশভবন, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ৯১।

৩৯. পুতুলনাচের ইতিকথা, প্রকাশভবন, কলকাতা, চল্লিশতম মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ১৮২।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।

৪২. ভূমিকা, জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, পৃ. vi।

৪৩. জগদীশ গুপ্ত গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৬৪৬।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪৭।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. vi।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩১।

৪৭. জগদীশ গুপ্ত; আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃ. ৩৮।

৪৮. জগদীশ গুপ্ত'র কথাসাহিত্য : ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে : বেস্ট বুকস্, কলকাতা, পৃ. ২৪৪।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪।

৫১. তিতির পত্রিকা, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, সম্পাদক : সঞ্জয় সাহা, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, পৃ. ১৩৮।

৫২. দুষ্প্রাপ্য জগদীশ গুপ্ত, প্রথম খণ্ড, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১১।